এক

শহর থেকে অনেক দূরে প্রকৃতি পরিশোভিতা একটি রমণীয় গ্রাম আলোকদিয়া। এমন সুন্দর একটি নাম কত বছর আগে কে দিয়েছিলো তা পাওয়া যায় না। সেই সময় এই নামের সাথে গ্রামের মানুষের হৃদয় আলোকিত ছিলো কিনা তা কেউ বলতে পারে না। গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব দুই দিকে সমতল কৃষিভূমি, উত্তর পাশে মস্ত বড় একটা জলাভূমি যার নাম আলোকবিল। পশ্চিম দিকে গ্রামের গা ঘেঁষে একটি বড় কাঁচা রাস্তা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। রাস্তার পশ্চিম পাশে গ্রাম। বহুদিনের পরিত্যক্ত একটি কাচারী বাড়ি। তারপরেই কমলাপুর গ্রাম। বড় রাস্তা থেকে একটি ছোট মেঠো রাস্তা এঁকে বেঁকে পূর্ব পশ্চিমে দুই গ্রামের সাথে মিশে গেছে। পূর্ব দিকে যে কোণের সৃষ্টি করেছে ঠিক তার মাথায় একটা বড় বট গাছ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তার ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে কত যুগ দাঁড়িয়ে আছে তারও কোনো হিসাব নেই। তারই নিবিড় ছায়ায় একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

যখন স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিলো তখন গাছ থেকে অনেক দূরত্ব রেখে করা হলেও পরবর্তীতে বৃক্ষরাজ কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেদিকে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সবুজ পত্রপল্লবে ছেয়ে এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। স্কুলের সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলার মাঠ। কমলাপুর গ্রামে কোনো স্কুল নেই। তাই ঐ গ্রামের ছেলে-মেয়েরা মাঠ পেরিয়ে আলোকদিয়া প্রাইমারী স্কুলে পড়তে আসে। রোদ বর্ষা মাথায় করে তাদের আসতে হয়। একান্ত যাদের শিক্ষার প্রতি আন্তরিক টান আছে তারা বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভালবেসে তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠায়। আর সেইসব ছেলে-মেয়ে অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিদের। গরিবেরা তাদের ছেলে-মেয়েদের জুতা, ভাল জামা কাপড় দিতে পারে না বলেই জোর করে ঠেলেঠুলে স্কুলে পাঠায় না। তবু কিছু ছেলে-মেয়ে তাদের বাবা মা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিতে না পারলেও প্রতিবেশী একান্ত খেলার সাথীদের সাথে স্কুলে আসে। কেবল স্কুল সূত্রেই নয় এক মাঠে চাষবাস আবার উভয় গ্রামের জনমজুরদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ কারবার সব শ্রেণীর মানুষের মাঝে একটা যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়েছে। আরও একটি বড় কারণ বছরের দুই পবিত্র ঈদের নামায দুই গ্রামের মানুষ মিলিতভাবে এই বটতলায় আদায় করে। অনেক বছর আগে

বটবৃক্ষের উত্তরাংশের বেশ কিছু এলাকা ঈদগাহ হিসেবে দান করেছেন আলোকদিয়া গ্রামের আবুল আসাদ খানের দাদী। প্রাইমারী স্কুলের জায়গাটাও একদিন খানদের ছিলো। তার দাদা পূর্ব দেশীয় একজন মৌলভী রেখে এখানে একটি পাঠশালা খুলেছিলেন। তখনই তিনি এক একর জমি পাঠশালায় দানপত্র লিখে দিয়ে যান। পরবর্তীতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপ নেয়।

ইদানিং দুই গ্রামের মানুষ মিলে বট গাছের দক্ষিণাংশে স্কুলের পেছনে সপ্তাহে দু'দিনের জন্য বাজার বসিয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে রাস্তার কোল ঘেঁষে একটা ওয়াক্তিয়া মসজিদ তৈরী করা হয়েছে। বাজারে বিক্রেতাদের কাছ থেকে সামান্য খাজনা নেয়া হয়। সেই অর্থ দিয়েই মসজিদের খরচ চলে যায়। আবার ঐ বাজারকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটা পাল্‌কী দোকানও আশে পাশে বসে গেছে। স্কুলের সভাপতি আবুল আসাদ খানের হাতে পায়ে ধরে কাজিম শেখ বিদ্যালয়ের পশ্চিম উত্তর কোণে বট গাছের ছায়ায় একটি ছোট্ট পাল্কির দোকান তুলেছে। সেই দোকানে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তার দশ বছরের ছেলে শহীদ বেচাকেনা করে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তার দোকানের খরিদ্দার। খাতা কলম, চকলেট, বিস্কুট থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের যা প্রয়োজন তা সব ঐ দোকানে পাওয়া যায়। অল্প টাকার মালামাল হলেও সংখ্যা অনেক। স্কুলের শিক্ষকরাও প্রতিদিন এটা ওটা নিয়ে থাকেন। পাশের বড় রাস্তা দিয়ে যারা যাওয়া আসা করে তারা ক্লান্তি দূর করার জন্য তার দোকানের সামনে পেতে রাখা বাঁশের চটার বেঞ্চিতে বসে যায়। তারাও কিছু না কিছু কেনাকাটা করে।

শহীদ ছেলেটা অল্প বয়স্ক হলেও তার কথাবার্তা, আচার ব্যবহার সবকিছুতে একটা অলঙ্কার আছে। অশিক্ষিত গরিব ঘরের ছেলে বলে মনেই হয় না। খুব পরিষ্কার চেহারা, বয়স অনুপাতে সুন্দর স্বাস্থ্য মুখে সদা হাসি প্রত্যেকেরই মন কেড়ে নেয়। সেখানে আরো কয়েকটি দোকান থাকলেও তার দোকানেই খরিদ্দার বেশী। বেচাকেনা হয় ভাল। স্কুলে তারই বয়সের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা বেশী। তাদের সাথে ওর খুব ভাব। তার ইচ্ছা হয় ওদের সাথে মিলেমিশে স্কুলে পড়া লেখা করা, খেলাধুলা করা। কিন্তু মনে করলেই তো আর সম্ভব হয় না। তার বাবা মাঠে-ঘাটে গৃহস্থের কাজ করে। সে বুঝে আব্বার খুব কষ্ট হয়। সে তার মায়ের কাছে শুনেছে তার আব্বা জীবনে মাঠের কাজ করেনি বরং জনমজুর খাটিয়ে কাজ করতেন। তার মা এর বেশী বলে না, সে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে যখন জানতে চায় সেইসব ফেলে আমরা চলে এলাম কেন? ওর মা তখন আঁচলে মুখ চেপে ধরে ফুপিয়ে কেঁদে ফেলে কোনো কথা বলতে পারে না। অল্প বয়স্ক এই গভীর

বুদ্ধির বালকটি তখন বুঝে নেয় তার মা বাপের অন্তরে একটা কষ্টদায়ক বেদনা লুকিয়ে আছে, সেখানে হাত দিলেই তারা ব্যথা পান। তারও মনে পড়ে দু'বছর আগের কথা। তাদের ঘর বাড়ি, পুকুর, ফলের বাগান, গরু বাছুর আরও কত কি ছিলো। সে গ্রামের স্কুলে পড়তো। তার পড়ার সাথীদের সাথে হৈ হুল্লা করতে করতে স্কুলে যেত! বাড়ি এসে তাদের সাথে খেলাধুলায় মেতে থাকতো। সন্ধ্যা হলেই তার চাচাতো ভাই বোনদের সাথে পড়তে বসতো। সে কেবল ক্লাস থ্রিতে উঠেছে এমনই সময় কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। একদিন রাতের বেলা বোচকা বুচকি বেঁধে বাবা মা তাদের নিয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

বড় হলে একদিন নিশ্চয় সে এর কারণ জানতে পারবে– এমন আশা সে রাখে। তার বাবা মা তাদের তিন ভাই-বোনদের খুব ভালবাসেন। সে বড়, মেজটি বোন আর ছোট ১টি ভাই। বাবা মা খেয়ে না খেয়ে তাদের খাওয়ায়, পরের বাড়ি কাজ করতে দেবে না তাই কিভাবে সে জানে না তার আব্বা এই দোকানটি করে দিয়েছেন। এতদিন সে সব সময় মনমরা হয়ে থাকত, কারও সাথে মিশতে পারত না। তার খেলার সাথীদের সে ফেলে এসেছে। এখানে সব নতুন। তার বয়সের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যায়, সে যেতে পারে না তাই কেউ যেন তার সাথে মিশতে চায় না। এবার তার নিঃসঙ্গতা দূর হয়েছে। স্কুলে পড়তে না পারলেও ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকদের সাথে সারাক্ষণ দেখা হচ্ছে– কথা হচ্ছে আবার বেচাকেনার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে। এখন বাড়িতে তার একটুও মন টেকে না। রাতটা পার হলেই হয়। দু'টো নাকে মুখে গুজে দোকানের দিকে দৌড় দেয়। তার ইচ্ছা স্কুলে ছেলে-মেয়েরা আসার আগেই সে দোকান খুলবে। সে জানে ন'টায় ক্লাস বসলেও ওয়ান-টু'র ছেলে-মেয়েরা সকাল সাতটার মধ্যে এসে কিচির মিচির করে। তারাই তার প্রতিদিনকার বাঁধা খরিদ্দার। হয় একটি কেক না হয় একটি পাউরুটি নতুবা বিস্কুট চকলেট। একটা না একটা কিছু তারা নেবেই। পল্লী অঞ্চলে গৃহিণীদের সকালেই সংসারের কাজ বেশী। তাই ছেলে-মেয়েরা যাতে ঝামেলা করতে না পারে, যার হাতে যেমন থাকে টাকা আধুলি তাদের হাতে গুজে দিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দেয়।

শহীদের সাথে তাদের সম্পর্ক এতো গভীর হয়ে গেছে দৈবৎ তার যদি আসতে দেরীও হয় তবু তারা অন্য দোকানে না যেয়ে ওর অপেক্ষায় বসে থাকে। বিক্রি বেশী অথচ পয়সা কম তবু তাতে তার লাভ বেশী। সে বুঝেছে বেশী পয়সার মালে লাভ কম। তাই সেসব মাল কম রেখে অল্পমূল্যের মাল বেশী করে রাখে।

প্রতি শুক্রবার স্কুল বন্ধ থাকে, সেই দিন সে তার আব্বার সাথে দূরের বড় বাজার থেকে মালামাল নিয়ে আসে। পাইকারী দোকানদার শহীদের বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে অনেক টাকার মাল বাকীতে দেন। তাই শহীদের ছোট্ট দোকানটি সব সময় মালামালে পূর্ণ থাকে। গৃহস্থ বাড়িতে সচরাচর যা দরকার হয় তা সব শহীদের দোকানে পাওয়া যায় বলে গ্রামের বৌ ঝি'রা তাদের স্বামীদের জ্বালাতন না করে ছেলে-মেয়েদের দিয়ে আনিয়ে নেয়। এতে বাড়তি যাওয়া আসা করতে হয় না। স্কুলে আসার সময় তাদের হাতে পয়সা দিয়ে বলে দিলেই হলো, ছুটির পর তারা তা কিনে নিয়ে আসবে। অনেকের হয়ত স্কুলে যাওয়ার মতো ছেলে-মেয়ে নেই, তাতে কি! পাড়ার যে কোনো ছেলে-মেয়ের হাতে পয়সা দিলেই এসে যাবে। এরও একটা কারণ আছে। শহীদ খুব বুদ্ধিমান ছেলে। সে খেয়াল রাখে যেসব ছেলে-মেয়েরা তার দোকানে কেনাকাটা করে অন্ততঃ একটা করে চকলেট বিনামূল্যে দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখে। স্বল্পবুদ্ধির বালক বালিকারা একটা চকলেট ফ্রি পেয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ি যায়। তারাই পাড়ায় পাড়ায় খরিদ্দার জোগাড় করে নিয়ে আসে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল আলীম সাহেব একদিন অবাক হয়ে গেলেন অল্প বয়স্ক এই বালকের কৌশল প্রয়োগ করতে দেখে। তার সাত বছরের মেয়ে লিন্ডা ক্লাশ টু-তে পড়ে। তিনি প্রতিদিন সাইকেলে চড়িয়ে তাকে নিয়ে আসেন আবার ছুটির পর নিয়ে যান। প্রায়ই তিনি লক্ষ্য করেন তার মেয়ের ব্যাগের মধ্যে বই খাতা ছাড়া কিছু না কিছু দ্রব্যসামগ্রী থাকে। প্রথম প্রথম তিনি মনে করতেন হয়ত বাড়ি থেকে কেউ কিছু নিতে বলেছে তাই কিনে এনেছে। একদিন তার খেয়াল হলো, তিনি দীর্ঘদিন ধরে সংসার চালিয়ে আসছেন। কিন্তু এমনভাবে খুঁটিনাটি দ্রব্যসামগ্রী দিনের পর দিন জোগান দিতে হয়নি। বর্তমান এই ছোট্ট মেয়েটি দিয়ে তা সমাধা করা হচ্ছে, এতদিন কে তা করতো! প্রয়োজন হলেও আমাকে বিরক্ত করা হবে বলেই কি সবাই এড়িয়ে থাকতো! সেদিন রাতে তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন– জানি সংসার চালাতে গেলে মোটামুটি সাথে ছোট খাটোরও প্রয়োজন হয়, তা আমাকে না বলে এতটুকু মেয়ে লিন্ডাকে বলা হয় কেন?

স্বামীর প্রশ্নে স্ত্রী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি বিস্মিত হয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন– তোমার এ কেমন ধরনের কথা। আমি তো কিছুই বুঝলাম না।

ওর কাছে মাঝে মাঝে এটা ওটা কিনতে দেয়া হয় কিনা তাই বলছি।

ওমা সে কী কথা! তুমি থাকতে আমি দুধের মেয়ের সাথে বলতে যাব কেন?

এই ধরো মাও তো বলতে পারেন।